তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি ঃ

নিবিড় পাঠ–‘জাগরী’–‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি ঃ নিবিড় পাঠ– 'জাগরী' – 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

বাংলা উপন্যাসে বিয়াল্লিশের গণ-আন্দোলনের ও সমকালীন রাজনীতির পাঠ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি আমরা। চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়ের ছবি বেশ কিছু কথা সহিত্যিকের রচনাতে পাওয়া যায়। আমরা এই অধ্যায়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসদুটিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে আবির্ভূত লেখকদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে শক্তিমান কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'জাগরী', উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ এর অক্টোবর মাসে। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' লেখেন। উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে ১৯৫০ সালে। ইউনেস্‌কো কর্তৃক বইটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Vigil' অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়। অনুবাদক অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী শ্রীমতি লীলা রায়। এটিই ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন অবলম্বনে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। সতীনাথের আরেকটি উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর প্রথম চরণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১তে। রাজনীতি, মূলত গত শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কংগ্রেসি আন্দোলন ঘুরে ফিরে এসেছে সতীনাথের উপন্যাসে।

সতীনাথ পূর্ণিয়াতে বাবার সঙ্গে ওকালতিতে সহকারী হিসেবে থাকলেও সেখানকার নানা সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায় "একটা Public Trust Fund দেখবার জন্য এখানকার লোকেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েচি। পুজোয় বলি তুলবার জন্য mass meeting আহ্বান করচি।"[১]

১৯৩৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ কিছুটা আকস্মিকভাবে পূর্ণিয়ার টিকাপট্টির গান্ধী আশ্রমে যোগ দেন। আশ্রমের প্রধান ছিলেন সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরী। এই সময় থেকেই তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে গণ্য হন। তাছাড়া ওকালতির অবসরে তিনি রাজনীতি, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ,র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম, ক্যাপিটালিজম,সোস্যালিজম, ব্রিটিশ ডেমোক্রেসি, রাশিয়ার অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনো করতেন অদম্য পাঠস্পৃহা নিয়ে বাংলা-হিন্দি-উর্দু-ফরাসি- সংস্কৃত এবং পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা যেমন ফরাসী-স্প্যানিশ-রুশ ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ও রাজনৈতিক লেখাও পড়েছেন। তাঁর আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে যোগদানের উপযুক্ত কারণ জানা না গেলেও মন যে আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল তা অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনা, সমাজসেবা, তত্ত্বদর্শন পাঠের পরিচয় থেকেই বোঝা যায়। ১৯৪০ এর জানুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে হাজারীবাগ জেলে কারাবাস করেন লেখক। এসময় জেলে তিনি সময় কাটাতেন উর্দু ও ফরাসী ভাষা চর্চা করে এবং তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' পড়ে। সতীনাথের একান্ত সুহৃদ ড: বীরেন ভট্টাচার্যের 'সকল কাজের সেরা' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, 'কংগ্রেসে যোগ দিলেও সতীনাথ কখনো রাজনৈতিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। ১৯৩৯ এ তিনি ছিলেন মনে প্রাণে কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের পহ্লপাতী। কমিউনিস্টদের সংগঠন হ্লমতার তিনি প্রশংসা করতেন, কিন্তু পরদেশ - মুখাপেহ্লী কোনো রাজনৈতিক নীতি সমর্থন করতেন না।"[৩] রাজনৈতিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে সতীনাথের আলাপ বহুকালের। কিন্তু ঘনিষ্টতা হয় ৪২এর আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে। সতীনাথ বিহারের সোস্যালিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই দলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তা জানা যায় জয়প্রকাশ নারায়ণের লেখা 'স্মরণাঞ্জলি'থেকে, — "আমার রাজনৈতিক জীবনের মধ্য বেলায় সতীনাথের সঙ্গে পরিচয়.... ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর জেল থেকে

বেরিয়ে এসে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর যখনই পূর্ণিয়া গেছি সতীনাথের সঙ্গে অবশ্যই সাহ্লাৎ করতাম। সতীনাথ তখন পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের কর্ণধার। আমার সোস্যালিস্ট পার্টি আগে কংগ্রেসের অংশ ছিল। এইজন্য সতীনাথ সহজেই এই দলের সংস্পর্শে আসেন এবং যোগদান করেন। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের দুঃখে দ্রবীভূত হয়ে যেত। সমাজবাদের মধ্যে তিনি দরিদ্রের মুক্তি দেখতে পান আর ফলে আমার সহকর্মী হয়ে চলে আসেন।"[৪] শুধু জয়প্রকাশ নন, অনুগামী বন্ধু ড. বীরেন ভট্টাচার্যরও প্রতিবেদনেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে – "কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ, গঙ্গাপ্রকাশ সিং এবং বিহারের আরও সোস্যালিষ্ট কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে মনস্থির করেন। ১৯৪২ আন্দোলনের পূর্ণিয়া জেলার সংগঠনের ভার সতীনাথের উপর ন্যস্ত ছিল গোপনে। বিপুল অর্থের হিসাব, রিভলভার আনা-নেওয়া ও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ সতীনাথ ও আমরা কয়েকজন মিলে করি। সতীনাথ ধরা পড়লেন।....

১৯৪৫ সালে সতীনাথ আবার কংগ্রেসের কাজে মেতে গেলেন। পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে তাঁর পরিভ্রমণ। বিহারের জনতার মধ্যে ভাদুড়ীজী' নামে তাঁর পরিচয়।"[৫]

দীর্ঘ দুটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, সতীনাথ সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখের প্রেরণায়। দ্বিতীয়ত তিনি গোপন কাজ, অস্ত্র সংরহ্লণ ইত্যাদি কাজের জন্য ধরা পড়ে কারাবরণ করেন ৪২ এ এবং তারপরে ৪৪ সালে। এর আগে ১৯৪১ এ ছ' মাসের জন্য কারাবরণ করেন। সে সময় তিনি পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। ৪২ এ ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে 'জাগরী' লিখেছেন। এসব থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে ১৯৪১ এর পর থেকে ৪৪ পর্যন্ত তিনি গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা হয়েও সোস্যালিস্ট কার্যকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন। ড. বীরেন ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তথ্যমতে

সতীনাথ ১৯৪৫ থেকে আবার কংগ্রেসের কাজে মেতে ওঠেন। তবে তিনি মনে প্রাণে সমাজবাদী ছিলেন। কমিউনিস্ট সংগঠনের তিনি প্রশংসা করতেন; কিন্তু বিদেশি অনুসরণ নীতিকে পছন্দ করতেন না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় তাঁর ঝোঁক ছিল সমাজবাদে। শোষিত জনগণের ব্যথা বেদনায় তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তিনি বরাবরই সাম্যবাদী চিন্তাধারার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভক্ত কোনোদিনই হন নি। ৪২ এর আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর যুক্তিবাদী মন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আদর্শগত গোঁড়ামিতে বিব্রত হয় আর অন্যদিকে গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি অন্ধ ভক্তি সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলাদলি, নেতা ও কর্মীদের সুবিদাবাদী মনোভাব, গান্ধী আদর্শে আইন অমান্য,অসহযোগের সুযোগ নিয়ে রাতারাতি প্রধান হয়ে ওঠার চেষ্টা ও এদের মধ্যে নতুন শাসক শ্রেণি, পুঁজিবাদী নয়া বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে দেখে তিনি ক্রমেই রাজনীতিতে আস্থা হারান। এ প্রসঙ্গে দাদামশায় কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন— "সে হল একটি হুরধার intellect এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere কিন্তু ও circle এ যে প্রায়ই মূর্খ, মিথ্যাভাষীদের সঙ্গ জুটবে। মনের মতো দোসর বা বন্ধু পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না কী করে কাটবে"[৬]। কথা গুলো অহ্ররে অহ্ররে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। এসব অভিজ্ঞতা 'জাগরী'তে এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এ লাডলীবাবু রাজাসাহেবের মতো শোষক চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। মতাদর্শের বিরোধের চিত্র ইতিহাসসম্মত ভাবেই ফুটে উঠেছে 'জাগরী'তে, 'ঢোঁড়াই'এর 'আজাদ দস্তা'য়। বস্তুত আমাদের নির্বাচিত দুটি উপন্যাসেই ১৯৪২এর আগস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছবি ডিটেল সহ উঠে এসেছে একজন রাজনৈতিক কর্মীর লেখায়।

চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা 'জাগরী'। জাগরী শব্দের অর্থ নিদ্রাহীন বা যে জেগে রয়েছে এমন। একটি পরিবারের চারজনের জীবনের আদ্যোপান্ত কাহিনি নয়

এ উপন্যাস। বরং একটি রাতে পরিবারের চারজনের বিচ্ছিন্নভাবে বিনিদ্র রজনী যাপনের কাহিনি 'জাগরী'। পরিবারের বড়ো ছেলে বিলু ফাঁসির সেলের আসামী। ৪২ এ আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বিহার অঞ্চলে যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায় তাতে নেতৃত্ব দিয়ে বিলু ধরা পড়ে ও তার ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের সন্ধ্যায় বিলুর আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিবেদনের আখ্যান দিয়ে আখ্যানের সূত্রপাত। এই জেলেরই আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে বন্দি রয়েছেন বিলুর বাবা, প্রাক্তন প্রধান শিহ্লক, বর্তমানে আদর্শ গান্ধীবাদী নেতা। তিনিও রুদ্ধশ্বাসে বড়োছেলের ফাঁসির আগের রাতে নিঃশব্দে দুঃখ জয় করবার চেষ্টা করছেন। 'আওরৎ কিতায়' স্বামীর আদর্শের অনুগামিনী বিলুর মা হ্লোভে অনুশোচনায় আত্মপীড়নে দগ্ধ। তিনি পুত্রের জীবনের চরম মুহূর্তটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বাইরে জেল- গেটে সেই অন্ধকারে এই পরিবারের একমাত্র মুক্ত, কনিষ্ঠ পুত্র নীলু জেলার সাহেবের চিঠি নিয়ে অপেহ্লা করছে। তারই হাতে দেওয়া হবে দাদার মৃতদেহ।

একটি অন্তিমহ্লণের বৃত্তকে কেন্দ্র করে চারজনেই সম্পূর্ণ একাকী আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে এবং একে অন্যকে বিচার বিশে-ষণ করেছে বর্তমানের অনুষঙ্গে আর অতীত স্মৃতিচারণায়। চারজনের আপাত-বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো স্মৃতিচারণে, স্বগতকথন ও বিশে-ষণের সাহায্যে পরিবারের চারটি চরিত্রই তাদের দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ সংস্কার উদারতা নিয়ে পরিপূর্ণ, অন্তর্মুখী , স্বতন্ত্র, ব্যক্তিচরিত্ররূপে পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। তবে এহ বাহ্য। সেই সঙ্গে এই শতকের তিরিশ-চল্লিশ দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের চেহারা, বিভিন্ন মতবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের দলাদলি, মতবিরোধ,সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুহ্লতা, দলের লোকদের স্বার্থবিরোধী সুবিধাবাদী মনোভাব, দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ—তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সামগ্রিক দুঃখবেদনা ভরা জেলের জীবন — তার বিচিত্র অনাচার, অন্যায় লোভ, শাসন শিথিলতা,

বন্দি কয়েদিদের বহু বিচিত্র অপরাধ ও আচরণ নিপুণ শিল্পীর অভিজ্ঞ কলমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসের তিনটি পুরুষ চরিত্র তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। তিনজনেরই আত্মসমীহ্লার বিস্তৃত প্রতিবেদন রয়েছে আখ্যানে। ফলে একটি মাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন রাজনীতির মত ও পথগুলিকে দেখা হয় নি। বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপটি বিশ্লেষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। ফলে এখানে শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়নি। প্রত্যেকে নিজের দলের বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও কাজের সাফল্যের সঙ্গে অন্যদলের তফাৎটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না হলেও পর্যালোচনা করেছে। অন্যদলের প্রেহ্লিতে নিজেদের সংগঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও ধরবার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বাবার স্বগত-ভাষণ অংশটি লহ্ল্য করবার মতো। তিনি নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী। বিয়াল্লিশের 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র ডাকে তিনি আজ জেলে বন্দি। সেখানে অন্যান্য দলের নেতৃস্থানীয় প্রথম শ্রেণির বন্দিদের সঙ্গে তিনিও দিনযাপন করছেন। এই আপার ডিভিশন ওয়ার্ডটি যেন 'জাগরী'র পাঠকের কাছে কালের দলিল হয়ে আছে। রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ, বিশ্বাস, আত্মসর্বস্বতা, বিচ্ছিন্নতা, উন্নাসিকতার সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে বাবার একটি রাত্রির আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে। গান্ধীবাদীরা সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনায় বসলে সোস্যালিস্ট সদস্যেরা বেসুরে অন্যগান শুরু করে যে অসহিষ্ণুহ্লতার পরিচয় দেয় তা তাঁর পীড়ার কারণ হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে উদারতা তাঁর দলেরও নেই— "তাহারা বলে আমরা ছোট হইব কেন? উহারা যে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নাকের সম্মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে, লছমীকান্তের মার্ক্সক্লাসের লেকচারের ঠেলায় যে আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই— আমরা কি কিছু বলি?"[৭] তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের এই সব নবগঠিত দলগুলির অধিকাংশ সদস্যই ছেলেমানুষ। তাদের সহিষ্ণুহ্লতা নেই। আত্মশ্লাঘা, ব্যক্তিগত বিরোধ, উচ্চাভিমানকে এই

প্রবীণ আশ্রমবাসী বাবা উদার দৃষ্টিতে দেখেন ও আত্মসমালোচনায় নিজেকে নিয়ত শুদ্ধ করেন— "ঐ সব একরত্তি ছেলে। ওদের আবার দোষগুণের বিচার করিতে যাইব আমরা! তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে..... এখনও আমরা আমাদের মনের বৃত্তিগুলি সংযত করিতে পারি নাই। আর উহারা তো ছেলেমানুষ"।[৮] অথচ তিনিই আবার বলেন— "দলে দলে রাজনৈতিক কর্মীরা আমাদের মত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বোঝো না বোঝো, মানো না মানো সোস্যালিস্ট হওয়া তো একটি ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।.... নিজের দেশের বেদ, পুরাণ, মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল— সকালের নজর রুশের উপর। আরে,রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতে?... দেশ বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন, কোসুথের অমর কাহিনী আমদেরও রোমাঞ্চ আনিয়া দিত। ..... কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেহ্লা স্টালিনকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।"[৯] গান্ধীজীর সূত্রযজ্ঞে বিশ্বাসী, আত্মশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশোধনে আগ্রহী,প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার ও বসন সম্পর্কে অনাসক্ত বাবা অর্থাৎ গান্ধীবাদীর দৃষ্টিতে কমরেড বৈদ্যনাথের সাজসজ্জা বিসদৃশ ঠেকে। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায় তাঁর আত্মকথনে—"রোগা, শুকনো দড়ি পাকানো শরীর। পায়জামা পরিহিত, গায়ে পাঞ্জাবি, কলারটি উচুঁ। সোস্যালিস্টদের সকলেই দেখি 'কাপড়াগুদাম এর কয়েদী দরজিকে বিড়ি দিয়া,এইরূপ জামা তৈয়ারি করাইয়াছে। এত গরমেও ইহারা খালি গা করিবে না। এঁরাই আবার পৃথিবীতে সর্বহারার রাজ্য আনিবেন।[১০] অপরপহ্লে সোস্যালিস্টরা গান্ধীবাদীদের যে চোখে দেখে তাও বাবার স্বাগত আলাপে ধরা পড়ে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মতবিভেদ ও ত্রুটি — বিচ্যুতি যে কি পরিমাণ তাও পাঠকের অগোচর থাকে না— "কেয়া সদাশিউ, ভূমিহার-রাজপুত-জাতীয় মহাসভা কী বৈঠক খতম হুই'— কমরেড বৈজনাথ সদাশিউকে

ব্যঙ্গ করিয়া বলিল। লহ্ন্য 'সূত্রযজ্ঞে'র উপর। বিহারের গরমপন্থীরা, অর্থাৎ সোস্যলিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার সদস্যরা, দহ্লিণপন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র মাত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত লইয়া, আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কথাটা কতকাংশে সত্য। জেলের মধ্যেও দেখি রামশরণজী আর হরিহরজী জাতের ভিত্তিতে ছোটো ছোটো উপদল গড়িবার চেষ্টা করেন— বাহিরে গিয়াও যাহাতে তাঁহাদের লীডারগিরি বজায় থাকে। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও হইবে? এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তার সবই ভুল নয়।"[১১]

শুধু বাবাই নয় কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী নীলুর চোখেও অন্য দলগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়েছে। সে দেখেছে কংগ্রেস সংগঠনে ধনী কিষানদের অন্যায় লোভ— "আসল কথা বড়ো একান্নভুক্ত পরিবারের সকল লোকের কাজ, জমিজমা দেখিতে দরকার হয় না। বাড়ির অন্ন ধ্বংস করিয়া গ্রামে জটলা করা অপেহ্লা এক আধজনের কংগ্রেসে যোগ দান করা ভালো। ইহাই বড়ো কৃষাণদের মনোবৃত্তি। কংগ্রেস সংগঠন হইতে যতটুকু সুবিধা পাওয়া সম্ভব, তাহা এই দানে'র দ্বারা নিশ্চিত হইয়া যায়। চাই-কী, ভাই যদি কংগ্রেস কর্তৃপহ্লের মন যুগাইয়া চলে তাহা হইলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। নেহাৎ যদি কংগ্রেস কোনো বিষয়ে ধনী কৃষাণের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা গায়ে না মাখিলেই হইল। শেষ পর্যন্ত নৈতিক প্রভাব ব্যতীত আর কোনো শক্তিই তো কংগ্রেসের নাই....।"[১২] কংগ্রেসের এই শ্রেণিস্বার্থবাহী ভূমিকা নীলু বিলুর মতো তরুণদের আঘাত করে। কংগ্রেস যে জমিদারদের হাতের খেলার পুতুল তা নীলুর পর্যবেহ্লণে ধরা পড়েছে। ..."এক মাষ্টারসাহেব আছেন বলিয়া এ জেলায় মহাত্মাজীর কাজ কিছু হয়। না

হইলে ইহাদের অর্ধেক লোক তো ঠগ।....সত্যই তো কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে। জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত হ্লেত্রে আধিয়াদার, বাটাইদারি বা নিঃসম্বল হ্লেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না, কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সহদেও এর মতো কংগ্রেসীকর্মীও আধিয়াদারের কায়েমী স্বত্ব বন্ধ করিবার জন্য 'বন্দোবস্তী'র মিথ্যা দলিল তৈয়ারী করিয়াছে।"[১৩] ব্যক্তি সতীনাথের মতো তাই তারাও কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কিন্তু নীলু ধীরে ধীরে ভিন্ন রাজনীতির স্বাদ পায়। তার চোখে দাদার রাজনীতির ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে— "দাদার পহ্লপুটে থাকিয়া যে ভঙ্গীতে রাজনীতিহ্লেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন, jaundiced ,ভ্রান্ত; উহা সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস মাত্র। যথার্থ সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই,— জাতীয়তার বাহিরে দেখিবার হ্লমতা তাহাদের নাই।"[১৪] নীলুর মনোভঙ্গিতে সোস্যালিস্ট দলের নেতৃত্ব সম্পর্কেও সংশয় জাগে, তার মতো একনিষ্ঠ কর্মীর কাছে "রাজনৈতিক কর্মীর জীবন তাহার পার্টির ভিতরে— পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে।"[১৫] এই নীলু সোস্যালিস্ট দলের নেতাদের সম্পর্কে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।

উপন্যাসটিতে এক অরাজনৈতিক চরিত্র 'মা'ও এই দলগুলি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। স্বামীর অনুগামিনী হয়ে আশ্রমবাসিনী হয়েছিলেন তিনি। মনে হয় 'মা' যেন শোষিত মধ্যবিত্ত নারী সমাজের এক জীবন্ত প্রতিনিধি। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বামীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে তাঁর মাতৃত্ব অতৃপ্ত থেকেছে। মা বিলুর আজকের এই পরিণতির জন্য সেই অবস্থাকেই দোষারোপ করেছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ওপর তাঁর হ্লোভ ও অন্তরের জ্বালা যন্ত্রণাকে উগরে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত

পথকে তিনি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর চোখে মহিলা কংগ্রেস কর্মীর কপটতা খুব সহজেই ধরা পড়েছে— "কাম্‌লাদেবী এসেম্বলীর মেম্বার কিনা, ইংরেজি জানে না, কি করে যে হাত তোলা ছাড়া, সেখানকার অন্যকাজ চালায়, তাতো বুঝি না। .....কাম্‌লাদেবী চায় না যে বিহারে কোনো লেখাপড়া জানা মেয়ে কংগ্রেসে আসুক। তাহলে ওর কদর কমে যাবে কিনা। সেইজন্যও ও এই বোকা সোকাগুলোকে নিয়ে জটলা করে।"[১৬]

যে আন্দোলন এই পরিবারে চরম সংকট সৃষ্টি করল, সেই রাজনৈতিক পরিবেশ ও তার প্রভাব লেখক অবশ্য উপন্যাসে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেন নি। শুধু 'বিলু' অংশে আন্দোলনের বিহ্বল চেহারা ও তাতে বিলুর ভূমিকা একবার মাত্র বিবৃত হয়েছে। বিয়াল্লিশের গণঅভ্যুত্থানের খণ্ডচিত্র পাই বিলুর স্মৃতিচারণায় — "যাহা দেখিয়াছি— জনশক্তির প্রকৃত স্বরূপ— গত আগস্ট মাসে যাহা দেখিয়াছি- যুগযুগ সঞ্চিত জগদ্দল পাথরের নীচে যে সুপ্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি— তাহা সচেতন হইলে কে কি করিতে পারে,.....বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া আনিয়া রাস্তায় স্তুপীকৃত করিতেছে করৈয়া গ্রামের শতাধিক লোক।.....পূর্ণিয়া রোডের উপর গাছের গুঁড়ির একটি 'ব্যারিকেড' গড়িয়া উঠিল। অদম্য উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের আজ হইল কী ?.... কাঠের গুঁড়ির স্তূপ অনেক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে আর মিলিটারি লরি আসিতে পারিবে না। রহুয়ার কাছে রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো বট গাছ .... কুড়ুল, কোদাল, দা, কাটারি যে যাহা পাইয়াছে হাতে লইয়াছে।..... পরিশ্রান্ত হইলেও থামিবার উপায় নাই।.... রহুয়া গ্রামের লোকেরাও আসিয়া জুটিল। দুই ঘন্টায় রহুয়ার পর্ব শেষ; কৃত্যানন্দনগর রেল স্টেশনের দিকে। রাস্তা বন্ধ করায় কোন উদ্দীপনা নাই। থানা জ্বালাইবার পর নেহাত এসব কাজ পানসে লাগিতেছে। এবার করৈয়া রহুয়ার সমবেত দল- ভুতাবিষ্ট ও নেশাগ্রস্তের মতো। ... জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে, পিছনে

ফিরিয়া তাকাইবে কেন?..... ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড়ো দায়িত্ব। ..... জনপ্রবাহ চলিয়াছে; আমাদের আদিম পুরুষেরা পেটের দায়ে, হতাশ হৃদয়ে অনিশ্চিত লহ্ন্য লইয়া যেরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এ সেরূপ নয়। ইহা নূতন জগতের আশায়, উদ্‌ভ্রান্ত জনতার অবধারিত লহ্ন্যের দিকে চলা। ..... রেল লাইন। দূরে কৃত্যানন্দনগরের গ্রামটি দেখা যাইতেছে। .... আধঘন্টার মধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেললাইন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। রেলগুলি ও কাঠের স্লিপারগুলি, সকলে কাঁধে করিয়া ভুট্টার হ্লেতে বা রেললাইনের ধারে ধারে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে"।[১৭] কমিউনিস্ট নীলুর চোখে বিয়াল্লিশের আন্দোলন শুধু হঠকারী উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি নাশকতামূলক কাজে নেশাগ্রস্তের মতো ছুটে চলেছে। এই বিধ্বংসী নাশকতামূলক কার্যকলাপকে নীলু ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে বলে মনে করে। রাজনীতিতে একরোখা, স্বভাবে গোঁয়ার, জেদী নীলুর চোখে এই আন্দোলন ভয়ঙ্কর অন্যায় বলে মনে হয়েছে— "এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশ সুদ্ধু লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করে দিয়েছে। যেখানে যাও মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফাটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।.... সম্পূর্ণ অরাজকতা ফ্যাসিস্তদের রাজত্ব— জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়— অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী- অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান"।[১৮] তার কাছে এই বিপ্‌ব— "হোলির দিন গ্রামশুদ্ধ লোক নেশা করিয়া যেইরূপ হইয়া যায়,ইহারাও ঠিক সেইরূপ। এই অধীর উত্তেজনাকেই দাদার দল বলে বিপ্‌বের ড্রেস রিহার্সাল,—ইহাই নাকি 'ক্রান্তির প্রচেষ্টা।"[১৯] নীলুর কাছে ক্রান্তিদলের ভণ্ডামি, চাঁদা আদায়ের নতুন পথ, স্বরাজীর নামে স্বেচ্ছাচার, দেশসেবার নামে জাতীয় হ্লতি, কাজের নামে উত্তেজনা পোষণ সবই কৃত্রিমতায় ভরা, উন্মত্ততায় জনতা দিশেহারা। জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতাই নীলুকে হ্লব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছে। এই সোস্যালিস্ট ক্রান্তি প্রচেষ্টার নেতা বিনায়ক মিসির সম্পর্কেও নীলু বীতশ্রদ্ধ। কারণ সে সর্বঘটে আছে—

'ছটপরবের পৌরোহিত্য করে। হিন্দু মিশনে লেকচার দেয়, খ্রীষ্টান সাঁওতালদের 'শুদ্ধি' করে, কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির সময় মন্ত্রীর টুর- এ মোটরে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসে। সে হাত গুনিয়া, বিবাহের দিন দেখিয়া, ঠিকুজি তৈয়ার করিয়া, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও টোটকা ঔষধ দিয়া বেশ পয়সা রোজগার করে। .... এইরূপ ধরনের নেতৃত্বে, এইরূপ সংগঠনে, এইরূপ সময়ে, হইবে ক্রান্তি"?[২০]

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভিন্ন রাজনীতি আদর্শের প্রকাশক হলেও দলের মুখপাত্র নয়। সতীনাথ কোনো বিশেষ দলের প্রচারক নন। চরিত্রগুলি কেউই টাইপ বা মতবাদের বাহক নয়। গণ আন্দোলনের বর্ণনা আছে , কিন্তু এই আন্দোলনের ফলাফল, জাতীয় জীবনে তার প্রভাব এই উপন্যাসে নেই। বরং ঔপন্যাসিক বিলুর মানবীয় দ্বন্দ্ব, নীলুর দ্বিধা, বাবার অসহায়তা, মায়ের করুণ আর্তিকে সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক আদর্শের উর্ধ্বে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট ও সঙ্কটমোচনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা নতুন চেতনার স্তরে নিয়ে গিয়েছেন, যেখানে সত্তার জাগরণ ঘটেছে। একটি রাত্রির স্মৃতিচারণায় তারা প্রত্যেকেই তাদের সম্পর্কের বিবর্তিত রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে। বরং বলা যায় এরা যথার্থ 'রাজনৈতিক' অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে 'ব্যক্তিক'। বিলুর অন্তিম স্মৃতিতে নীলুর উগ্র রাজনৈতিক চেহারার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে— "হাফপ্যান্ট পরিহিত নয় দশ বছরের ক্যাপ্টেন নীলু একটি চীনামাটির কাপ-সসার লইয়া গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিতেছে, হিপ্, হিপ্, হুর্‌রে! গরমে পরিশ্রমে, চিৎকারে মুখ লোহিতাভ।"[২১] নীলু বিলুর তুলনায় স্পষ্টভাষী। সে নিজে দাদার বিরুদ্ধে সাহ্ল্য দিয়ে অবধি নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। দাদার বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে তার আদর্শের তফাৎ তার স্বগতকথন অংশে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সেও একদিন দাদার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ক্রমেই স্পেনের কর্মীদের কাহিনি, লাল চীনের মরণজয়ী বীরদের কাহিনি, মাও-সে-তুং-এর শৌর্য ও একনিষ্ঠা, চক্রদেও এর ক্লাসের

লেকচার তাকে নিয়ে এসেছে অন্য পথে। তবু তার চোখে 'দাদার অন্যরূপ আচরণ অপ্রত্যাশিত'। অন্যত্র নীলুর মুখে শোনা যায়—"ও যে আমার দাদা। কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত একসূত্রে গাঁথা আমাদের জীবন। কিসে আমার ভালো হইবে, কিসে আমার একটু আনন্দ হইবে, এই চিন্তা সর্বদা তাহার মনে....।[২২]

কত সুখ-স্মৃতি, দাদার ভালোবাসার তুচ্ছ ঘটনা অন্ধকার রাতে জেল গেটে অপেহ্লামান নীলুকে নিয়ে যায় সকল রাজনৈতিক ভাবনার ওপারে যেখানে রয়েছে প্রীতির বন্ধন, সহোদরের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা, কর্তব্য ও দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অচ্ছেদ্য সুখানুভূতি।

বিলু-নীলুর মা ও সেই বিনিদ্র রাতে বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করেছেন 'নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাহ্লী?' তাঁর চোখে দুই ছেলের রাজনৈতিক জীবন, কর্মব্যস্ত দেশসেবার মূর্তি কোনো ছায়া বিস্তার করেনি। বরং সব ছাপিয়ে সেইসব দৃশ্য তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে— 'ইজের পরা দাদা বিলু— ছোট্টো নীলুকে গাল টিপে আদর করছে, নীলু নিল্লু-পিলু-পিল্লু।"[২৩] দুজনের ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরতা, ভালোবাসা, একসঙ্গে হাঁটাচলা বসা শোওয়ার ছবি মায়ের মনে যে স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে তাকে তিনি ভুলবেন কেমন করে! জেলের আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বসে বাবা, যিনি রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গী করেছেন — তিনিও পারেন নি তাঁর গান্ধীভাবাদর্শের মধ্যে বিলুকে ধরে রাখতে । তাঁর কাছে পুত্রদের ভিন্ন রাজনৈতিক মত কোনো সংকট বা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর চরম মুহুর্তে তাঁর মতো রাজনীতি সচেতন মানুষটির কাছে বিলুর ব্যক্তি পরিচয়টাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে— "মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে রং, একটু মেয়েলি ধাঁচের লম্বা ধরনের মুখ, চিবুকটি সরু, কালো চোখের গভীর দৃষ্টি ভাবুকতায় ভরা।"[২৪] এগুলি থেকে বোঝা যায় এই পরিবারটির জাতীয় সত্তা বা সামাজিক ভূমিকার চেয়ে ব্যক্তিসত্তার নিবিড় পরিচয় বড়ো হয়ে ওঠে।

জেলের মধ্যে বা জেলের বাইরে রাজনৈতিক ভূমিতে তাঁদের পরিচয় কেউ গান্ধীবাদী;

কেউ বা গান্ধীআদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে, ধনীকৃষকের আচরণে ঘৃণা বোধ করে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট; আবার সোস্যালিস্টদের ধর্মীয় কুসংস্কার ও উন্মত্ততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্যজন কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। একমাত্র 'মা' চরিত্রটি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে 'রাষ্ট্রীয় জীবন' বেছে নেন নি। তিনি একান্তভাবেই বাঙালি পরিবারের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে গড়া মা-এর এক আর্কেটাইপ। বাঙালি রমণীর স্বামী সন্তানকে ঘিরে যে আশা প্রত্যাশা জাগে, তাকেই মা রক্ষা করতে চান। কিন্তু স্বামীর সহধর্মিণী বলেই তিনি গান্ধীবাদী, স্বামীর রাজনৈতিক মতাদর্শ বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে কোথাও ভিন্ন মতাদর্শের সমস্যা, সংঘাত বড়ো হয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে নি। নীলুর সাক্ষী দেবার ঘটনার জের হিসেবেই রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়েছে মাত্র। এমনকি বিলুর প্রিয় জ্যাঠাইমা এই রাজনৈতিক পরিবারের পাশাপাশি থেকেও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং জ্যাঠাইমার সঙ্গে বিলুর মানবিক সম্পর্কের পরিচয়টাই বিভিন্ন জনের স্মৃতিতে সত্য হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, পরিবারের আপনজনেরাও এই মধ্যবিত্ত জীবনে অস্তিত্বের সঙ্কট, অনিশ্চয়তা, সংশয় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের গূঢ় রহস্য সন্ধানেই ব্যস্ত থেকেছে। মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কেউই জীবনকে তুচ্ছ করতে পারে নি। বিপন্ন মানুষের অন্তিম মুহূর্তে নিজেকে ও পরস্পরকে জানবার চিনবার; পিছু ফিরে পুরোনো বিগত সুখ দুঃখের অতীতটা আঁকড়ে বাঁচবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। চিরন্তন মানবিক বোধ, শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা, জীবনায়নের মধ্যে শেষ হয়েছে উপন্যাস। তাই রাত্রির প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে আর এক নতুন সকালের সূচনায়। আর এক সুন্দর জীবনের সম্ভাবনার আলোতে ভরে গেছে ভোরের পৃথিবী।

২

সতীনাথ ভাদুড়ীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। আকৃতির দিক থেকে

অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় যেমন বড়ো তেমনি গুরুত্বের দিক দিয়েও দুই চরণে লেখা উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে রাজনীতি ও সমাজনীতির গুরুত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ শতকের বিশের দশকের পর থেকেই ভারতবর্ষের সমাজ ও মানুষ ক্রমে রাজনীতির উত্তাল আবহওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক আলোড়ন সমাজের ভিত্তি ভূমিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই এ সময়ের সমাজ বলতে রাজনীতি – জড়িত বা রাজনীতি নির্ভর সমাজকে বুঝতে হবে। সতীনাথ এই চল্লিশের দশকের সমাজজীবনের সঙ্গে অভিজ্ঞতাসূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতো দেশকাল – ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন লেখকের পক্ষে সমকালকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সত্যনিষ্ঠা ও জীবনসন্ধিৎসায় সতীনাথ বাস্তব সচেতন লেখক। তাই স্বাধীনতার পরে রাজনীতির জটিলতায় হতাশ হয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে সাহিত্যে সমর্পিতপ্রাণ হয়েও বাস্তব জীবন, জনজীবন ও সমকালীন সময় নির্ভর সমাজকে কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ রাজনীতি তাঁর কাছে বহিরঙ্গ বিষয় নয়। তা জীবন প্রত্যয়ে সত্য। মানুষকে পরিপূর্ণ সত্যের আলোকে দেখা ও প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর মতো উপন্যাস তাঁকে লিখতেই হতো। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যে মাটিঘেঁষা সজীব মানুষগুলিকে তিনি দেখেছিলেন তাদের কথা না লিখলে যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন পূর্ণতা পেত না তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বোধহয় তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছাড়ার কারণ হিসেবে আপাত এড়ানো কথাটি বলেছিলেন। "কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজতো হাসিল হয়ে গেছে। এখন 'রাজকাজ' ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।"[২৫]

সেই 'রাজকাজ' বড়ো বড়ো কংগ্রেস কর্মীর। সেখানে সতীনাথের পক্ষে মন মেলানো সম্ভব নয়। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য কাজ ছিল। তিনিও দায়বদ্ধ ছিলেন। সে দায় সময়ের সঙ্গে পা ফেলে বদলাচ্ছে যে মানুষ, বির্বতিত

সেই মানুষের কাছে ও সমাজের কাছে। মানুষকে দেখার জীবনদর্শনে গভীর আস্থা নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ঢোঁড়াই নামের পরিচিত মানুষটিকে তিনি জেনেছিলেন, কাছে পেয়েছিলেন। তাকে বোঝবার ও সকলের কাছে বোঝাবার চেষ্টায় এক নতুন বাণী প্রকরণে লিখলেন "ঢোঁড়াই চরিত মানস" এর দুটি চরণ। নিজেই বলেছেন—"ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরহ্লর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।"[২৬]

তুলসী দাসের 'রামচরিত মানসে'র রীতিতে সতীনাথ রচনা করেছেন "ঢোঁড়াই চরিত মানস"। 'জাগরী'র মতো শিল্প বৈচিত্রেও এই উপন্যাসটি আকর্ষণীয়। লেখক ঢোঁড়াইকে গড়তে চেয়েছিলেন রামচন্দ্রের আদলে, কারণ দেশের মাধারণ মানুষের ভক্তি রামচন্দ্রের চরণে। উত্তর ভারতের মানুষের মনে রামের চেয়ে আদর্শ চরিত্র আর কেউ নেই। ঢোঁড়াইকে করতে চেয়েছিলেন এ যুগের রামচন্দ্র। যিনি 'নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে'। বাইরের গঠনেও রামায়ণের সাতকাণ্ডের মতো তিনি অংশগুলির নাম করেছিলেন 'আদি', 'বাল্য', 'পঞ্চায়েত', 'রামিয়া', 'সাগিয়া', 'লঙ্কা' ও 'হতাশা কাণ্ড'। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিতে অজস্র ঘটনা কাহিনি ও চরিত্রের সমাবেশে বিশালতা সৃষ্টি হয়ে করুণ ও শান্তরস সংমিশ্রণে যে মহাকাব্যিক রসাস্বাদ আনে তারই প্রকাশ ঘটেছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'।

"ঢোঁড়াই চরিত মানস" এর দুটি চরণেই রাজনীতি প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতবর্ষের তিরিশ-চল্লিশের দশক মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনের কাল আবার এই দুটি দশক বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা

জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সমসাময়িক জীবনধারা, সমাজধারাকে দ্রুত পালটে ফেলছিল, তা তৃতীয় দশক থেকে আরও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ক্রমেই নিজেদের অজ্ঞতা, বঞ্চনা ও শোষণের যথার্থ চেহারাটাকে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখছিল। এর আগে এমন সামগ্রিকভাবে এরা নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কটকে উপলব্ধি করে নি। করা সম্ভব ছিল না কারণ অর্থনৈতিক মন্দার তীব্রতা গ্রামের ভূমিলগ্ন মানুষগুলোকে এর আগে এত প্রবলভাবে বিচলিত করে নি। কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছিল, খাজনা ইত্যাদির চাপে ভূমিহীন হতে হচ্ছিল ভূমিনির্ভর মানুষকে। জমি চলে যাচ্ছিল একশ্রেণির হাতে যারা ক্রমেই কাঁচা পয়সার লেনদেন ও দেশীয় ব্যবসার সুযোগ নিয়ে অর্থলগ্নি করতে পারছিল। তারাই ক্রমে 'জাগরী'র ধনী কিষাণ, 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' রাজাসাহেব বা 'গনদেবতা'র কঙ্কনার জমিদার ও চামড়ার ব্যবসায়ী বা ছিরুপালের মতো নিষ্ঠুর শোষকের রূপ নিচ্ছিল। নুতন সামন্ততন্ত্রের এই চেহারা, দেশব্যাপী অত্যাচারের এমন অবস্থা, পুরনো সামন্তশ্রেণির হ্লীয়মানতা, রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মপরতা ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রবল দমননীতি— সবমিলিয়ে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানের অবস্থা তিরিশ চল্লিশের দশকে এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এরসঙ্গে এই পর্বের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথাও মনে আসে— দেশজুড়ে অজন্মা, খরা, প্রাকৃতিক বির্পযয়ের চরমরূপ; ৩৪-এর বিহার জুড়ে ভূমিকম্প, ৪০ এর দশকে দুর্ভিহ্ল ও পরে মন্বন্তর ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা দরিদ্র মানুষগুলোকে ক্রমেই বিপন্ন করে তুলেছিল।

এছাড়া এই সব সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অজস্র অভিশাপ-সংস্কারে ভারাক্রান্ত। সেই মানসিক অন্ধতা নিয়ে তারা নিজেদের করে ফেলেছে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীবদ্ধ, এর ওপর সমাজের ওপরতলার মানুষের সঙ্গে এই নীচের তলার মানুষগুলির বিভেদ ধনবৈষম্যের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আরো অসংখ্য বর্ণ, শ্রেণি, জাতি-বিভেদ অশিহ্লা বহুকাল ধরে পাষাণের

মত জগদ্দল হয়ে বসে এই দরিদ্র বঞ্চিত মানুষগুলোকে অন্ত্যজ করে রেখেছে। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে ও সমাজের দূরসীমা পর্যন্ত এই বিভেদনীতি মেনে নিয়ে তারা এতকাল জীবন কাটাতেই অভ্যস্ত হয়েছিল। তিরিশ-চল্লিশের দশকে এই পুরনো অন্ধ চেতনায় কিছুটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর এই তরঙ্গঘাত সৃষ্টি করবার ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্যই গান্ধীজীর। গান্ধীজীই এদেশে গন অভ্যুত্থানের প্রথম সার্থক আহ্বান করেন। অস্পৃশ্যতা মুক্তি, হরিজন আন্দোলনের ডাক এই মানুষগুলিকে মানবিক স্বীকৃতির প্রথম সুর শুনিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের আহ্বান এই অতি – সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে অধিকারবোধ কিছুটা হলেও জাগরুক করে তুলেছিল। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি 'জাগরী'র পরিবারটিকে রাষ্ট্র সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। দ্বিতীয় দফায় ১৯৩০ এর অসহযোগের ডাক,সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য সাধারণ মানুষের পরিধিতে যে ঢেউ তুলেছিল তারই বাস্তব আলেখ্য তৈরি হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে।

সাধারণ মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে কোনোকালেই সচেতন ছিল না, তখনও হয় নি। কিন্তু তাদের অভ্যস্ত সংস্কারবদ্ধ জীবনে একটা ঝড়ের হাওয়ার সংকেত শুনেছিল; তাকে তারা নিজেদের সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল ও আন্দোলনের কর্মপদ্ধতিকে নিজেদের মতো করে তৈরি করবার চেষ্ট করেছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের কাছে 'রংরেজ' বাহাদুরের অস্তিত্বের চেয়েও বেশি প্রকট ছিল হাকিম, দারোগা, কলস্টর,চ্যারম্যান, উকিলবাবু বা বচ্চন সিং, রাজাসাহেব, আনোখিবাবু এমনকি বাবুলাল চাপরাসী, কিংবা ছড়িদার তাদের কাছে 'হাওয়াগাড়ী চালানো সাহেবদের' চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। তাদের উত্তেজনা এদের ঘিরেই; ক্ষোভ বিদ্রোহ এদের প্রতি। 'বাদশাহী বদল, 'সার্বিক মুক্তি', এসব কথা তারা বোঝে না। এই পর্বে এরা শুধু বুঝেছিল — দিন

বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। কোনো কিছু পাওনা আদায় করতে গেলে অনুরোধ আর আত্মসমর্পণে কাজ হবে না। আদায় করতে হবে সংগ্রাম করে; শ্রেণিবদ্ধভাবে প্রতিরোধ তৈরি করেই সফল হওয়া সম্ভব।

ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দুটি চরণেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে উঠে এসেছে। বিহারের বিশেষ অঞ্চলের অন্তেবাসীদের জীবনধারার সামাজিক দলিল হলেও লেখকের শিল্প দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত তা গোটা ভারতবর্ষের অবহেলিত গ্রামীণ জীবনের যথার্থ সত্য ও সার্থক চিত্র হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসে গ্রামজীবনের লৌকিক রীতিনীতি , লোকাচার, সংস্কারের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। এর মূলে আছে লেখকের জীবনদৃষ্টির গভীরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায় যে এই জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কত প্রবল, কল্পনা আর বাস্তবের সংলাপে কিংবা মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই আদিম জীবন সম্পর্কে নিবিড় অনুরাগ অনুভব করেছিলেন— 'তাৎমাটুলি ধাঙড়টুলি ছোটবেলা থেকে আমার মনে অজানা স্বপ্ন রাজ্যের দুয়ার খুলেছে— ও নিয়ে না লিখে আমার উপায় ছিল না'। আক্ষরিক অর্থে এই গ্রামজীবন বাংলাদেশের বাইরে বিহারে। বিহার-নিবাসী সতীনাথের জীবনের সিংহভাগ এখানে অতিবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে তিনি জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় যে সত্য উপলব্ধি হয়েছে তাকে তুলে ধরেছেন ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। আগের উপন্যাস 'জাগরীতে'ও পূর্ণিয়া ও তাঁর চারপাশের জনজীবন, সেখানকার সাধারণ মানুষের বিয়াল্লিশের গণঅভ্যুত্থানে যোগদানের ইতিবৃত্ত, প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' প্রসঙ্গ নয়, লোক-জীবনও তাদের পরিবর্তনের গতিপ্রবাহই লেখকের প্রধান অবলম্বন। ঢোঁড়াই এর ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডি যেমন উপন্যাসে গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে; তেমনি 'ঢোঁড়াইদের' সমষ্টিগত জীবনচেতনার তীক্ষ্ণতায় লেখকের

'মানুষকে দেখা' যথার্থই পূর্ণতা পেয়েছে। তাই ঢোঁড়াইকে একক না করে সমষ্টিচেতনার পূর্ণরূপের প্রতিনিধি করেছেন। লেখকের মনোভাব শুধু 'ঢোঁড়াইকে তুলে ধরা নয় বরং ঢোঁড়াইদের জীবনালেখ্যর যথার্থ পরিচয় দেওয়া—সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরবার ইচ্ছা' নিয়েই 'রামচরিতমানসে'র অনুসরণে 'ঢোঁড়াই চরিত রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই সে সমাজের যথার্থ চালচিত্রটির আধারে পড়তে হবে ঢোঁড়াই-এর বা ঢোঁড়াইদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

উপন্যাসের সূচনা ঢোঁড়াই এর জন্মভূমি তাৎমটুলি নিয়ে। পূর্ববৃত্তান্তে তাৎমাদের আদি পরিচয় দিয়ে লেখক জাতটার রহ্লণশীল সাবেক জীবনধারার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন। 'জিরানিয়া' বা জীর্ণারণ্য হলো ঢোঁড়াইদের জীবনপ্রবাহের তটভূমি। তাৎমাদের কাছে জিরানিয়া 'ভারিসাহার' বা 'টৌন'(টাউন)। পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, রাস্তায় চলে টমটম। সেই শহরের প্রান্তে তাৎমাদের বাসস্থান— পশ্চিমে বকরহাট্টার মাঠ, দহ্লিণে মজানদী— মরণাধার বা কারীকোশী। 'মাঠের বুক চিরে' চলে গেছে কোশী শিলিগুড়ি 'পাক্কী'রোড। রাস্তার ওপারে ধাঙরটোলা। মাঝখানে এই রাস্তা, শুধু পথ নয়—উভয়সমাজের জাতকলহের 'বিচ্ছেদ রেখা'। তাৎমারা কোনোকালে জাতে তাঁতি থাকলেও এখন তাদের কাজ কুয়োর বালি ছাঁকা আর 'ঘরামির কাজ'— ফলে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। ধাঙড়রা নিজেদের জাতধর্ম ত্যাগ করে 'ক্রীশ্চান' হয়েছে। সাহেবদের বাড়িতে তারা মালির কাজ, সাফাই কাজ বা খানসামার কাজ করে মেয়ে পুরুষে মিলে। তাৎমারা বর্ণসমাজের অন্তেবাসী মানুষ হলেও বর্ণসমাজের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ভাবনার জগৎকেও। তাই, তাৎমাদের জাত্যাভিমান প্রবল, 'বুড়বক কিরিস্তান' ধাঙড়দের তারা ঘৃণা করে। ভারতের গড়পড়তা প্রান্তবাসী মানুষের প্রতিনিধি তাৎমা-ধাঙড়দের চিন্তা বিশ্বাস ভাবাদর্শের জগৎ নানা অলৌকিক আধিভৌতিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ- যার মধ্যে যেমন আছে জিন- গুনী- গোঁসাইথানের মহিমা, তেমনি

'গানহী বাবা'র অতিকথা বা মিথ। তাৎমা ও ধাঙড়পাড়ার দিনযাত্রার ঢিমেতালে বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময়কার গ্রামীণ জীবন যা মূলত পুরোনো ঐতিহ্যনির্ভর জীবনচর্যায় আস্থাশীল ছিল সেটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষিনির্ভর সমাজের মন্থর পরিবেশ মূলত ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশের জীবনধারার গতিনির্দেশকারী। সমাজের গতির রূপরেখা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতে অর্থনীতির সূচকদণ্ডটি তেমন দ্রুত ওঠা নামা করে নি। ফলে প্রায় যোগাযোগহীন জাত-জীবিকানির্ভর মানুষের জীবনে তার ঢেউ বড়ো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। তাৎমা সমাজও এই কারণেই মন্থর ছিল বলে মনে করা অসমীচিন হবে না।

কিন্তু স্থবির জীবন ও সমাজের কাহিনি রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর অভিজ্ঞতায় মানুষ ও তার সমাজ সজীব ও গতিসম্পন্ন। দ্বান্দ্বিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে তার প্রবাহ চলেছে। কাল থেকে কালান্তরে পুরোনো সঞ্চিত মূল্যবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে মানুষ অর্জন করছে পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। লেখক ঢোঁড়াই ও তার প্রতিবেশকে ক্রমশ সমকালীন রাজনীতির তাপে একটু একটু করে তপ্ত করে তুলেছেন। মধ্যবিত্তের হ্লেত্রে যাই হোক, নিম্নবর্গের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করেছে, বলা যায় মধ্যবিত্তবর্গের কৌশলে রাজনীতির লাভহ্লতির হিসেবে নিম্নবর্গ ব্যবহৃত হয়েছে তিরিশের দশকে গান্ধী মিথকে কেন্দ্র করে। আদিকাণ্ডে ১৯২০-২১ এর আন্দোলনের প্রসঙ্গ বারবার স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। প্রথম লহ্ল করা যায় ঢোঁড়াই ভিহ্লের সময় রামায়ণ ছেড়ে মানে না বুঝেই 'হাড়তাল' সম্পর্কিত 'বটোহী'র গান গাইছে কারণ এ সময়টায় এ গান খুব চলতি এবং তাতে ভিহ্লাও জোটে ভালো। এখনও তাদের জীবনে 'গানহীবাবা' আসেন নি। সেই বার্তা প্রথম এলো মাস্টারসাবের চাকরি ছাড়ার প্রসঙ্গে। কিন্তু সেখানেও

তাদের বিশ্বাস "ছুট গয়ী নোকরি, সটক গয়া পান"। দারোগা কলষ্টর যাদের কাছে প্রত্যহ্ল যম, স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের কাছে বড় সুদূর। ঠিক এই জায়গাতেই বাল্যকাণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে এল 'গানহীবাওয়ার বার্তা: "গানহী বাবা কে? গানহী বাবা? বড়া গুণী আদমী। বৌকাবাওয়া আর রেবনগুণীর চাইতেও 'নামী'। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাষ্টারসাব চেলা হয়েছে। গানহীবাওয়া মাস্‌মছলী নেশা ভাঙ থেকে 'পরহেজ'। সাদি বিয়া করে নি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।"[২৭]

এরপরই গান্ধীর অলৌকিক হ্লমতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি: তাৎমাটুলিতে চালকুমড়োর গায়ে সবুজের মাঝে সাদা রঙের গানহীবাওয়ার 'মূরত' আঁকা হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং রেবনগুণী গানহী-বাওয়ার কাছে 'লোহা' মানেন। আর 'চাকের মৌমাছি নড়ে বসার মতো একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মধ্যে। রেবনগুণী যার 'লোহা মানে' সে তো প্রায় রামচন্দ্রজীর সমান। 'অতবড় না হোক, অন্তত গোঁসাই কিংবা ভানমতীর মতো জাগ্রত দেবতা তো বটেই।"[২৮]

গনেশপুরের বেলগাছের মগডালের পাতায় দেখা যায় স্পষ্টাহ্লরে গানহীবাওয়ার নাম, গলায় কণ্ঠি ঝুলিয়ে 'গানহীবাওয়া'র 'ভকত' হওয়ার লোকেরও অভাব হয় না। লহ্ল করার মতো, গানহীবাওয়ার প্রসঙ্গে উপন্যাসে একাধিকবার আসে রামচন্দ্রজীর প্রসঙ্গ। গান্ধীকে নিয়ে যেসব অতিকথা নিম্নবর্গ সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, তা কি শুধুমাত্র নিরহ্লর মানুষের কল্পনা, না কি এই মিথ তৈরি করার পেছনেও একশ্রেণির মানুষের স্বার্থের জটিল অঙ্ক রয়েছে? একথা ইতিহাস সম্মত যে গান্ধীমিথ সচেতনভাবে তৈরি করা হয়েছিল নিম্নবর্গের মানুষকে রাজনীতিতে ব্যবহার করার জন্যই। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস': অনন্যতার সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে "গান্ধীর এই ভাবমূর্তি সেদিন নিছক গল্প কথা ছিল না। উপন্যাসকারের নিছক কষ্টকল্পনা ছিল না যে বোঝা যায় শাহিদ আমিন এর

"Gandhi as Mahatma Gorakhpur District, Easter up". শিরোনামের প্রবন্ধে সংগৃহীত জনশ্রুতিগুলি পড়লে। যদিও সতীনাথের প্রধান কৃতিত্ব 'কলির রঘুনাথ' গান্ধীর 'মিথ'গড়ার মধ্যে নয়, তাকে ভাঙার মধ্যে। একথা সত্যি-শুধু 'জাতির পিতা' বলে নয়, ভারতীয় গণ আন্দোলনের 'পিতা' হিসেবে এদেশের ইতিহাসে গান্ধীজীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে; স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর জাতপাত বিরোধী অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা। কিন্তু তার বাইরেও তাঁকে সযত্নে 'লার্জার দ্যান লাইফ' করে তোলার রাজনৈতিক অপচেষ্টাও কিছু কম হয় নি, এবং এ ব্যাপারে নিরহ্লর দেহাতি মানুষের অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে সুশিহ্লিতের রাজনৈতিক অঙ্ককষা স্বার্থন্বেষী মন কিছুমাত্র কম দায়ী নয়। সেয়ানা সুবিধাবাদী মানুষের সুলভে বাজী জিতে নেবার মোহ্লম টেক্কা এই 'গান্ধী মিথ'। তাদের রাজনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগের চমৎকার লগ্নি এই গান্ধী অতিকথা— এমনটা বাস্তবের মতন এই উপন্যাসেও সত্য হয়ে উঠেছে লাডলীবাবু কিংবা বচ্চন সিংদের লোভী আচরণের মধ্যে। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী তা দেখেছেন, সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন"।[২৯] এই পর্যবেহ্লণ যথার্থ।

ঢোঁড়াই এর সংগ্রাম শুরু হয় তৈরি করা জাতের নিয়ম ভাঙার মধ্য দিয়ে। পরিবর্তমান সময়ের ডাক শুনতে পেয়েছে সে। বনেদি ব্রাহ্মণ জৈশ্রী চৌধুরী যখন বিনা প্রতিরোধে সকলের সামনে হাল চালায়, তখন তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইও প্রথা ভেঙে 'পাক্কী'র কাজ করতে যায়। ঢোঁড়াই দেখেছে, রাবিয়ার বাড়ির যে কুমড়োতে গান্ধীর মূর্তি ফুটে বেরিয়েছিল, রেবনগুণী তা দিয়েই পয়সা রোজগার করছে। শঠ ছড়িদার ধনুয়া মাহাতো গানহী বাওয়ার 'ভকত' হয়ে যায়, গানহীবাওয়া তাদের উপর অচিরেই কৃপা বর্ষণ করেন। ঢোঁড়াইর প্রথম প্রতিক্রিয়া 'পাক্কী'র কাজে যোগদানের মধ্য দিয়ে বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে সে পরিচিত হয়, পরিচিত করায় তার সমাজের মানুষদের। চিন্তাধারা, ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসভঙ্গির পরিবর্তনে সে সাহায্য করেছে নিজেকে ও সমাজকে বদলাতে। এর সঙ্গে যুক্ত হল ঢোঁড়াইর

ব্যক্তিগত প্রণয়, বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান, রামিয়ার বিশ্বাসভঙ্গ— এই ঘটনাগুলি তাকে চালিত করল লেখকের পরিকল্পিত অভিমুখে। কারণ তাৎমাটুলির প্রেহ্লাপটে ভূমিভিত্তিক আর্থিক সম্পর্ক স্পষ্ট নয়, অথচ গ্রাম ভারতবর্ষে সামাজিক শক্তিসমূহের যাবতীয় টেনশন ভুমিভিত্তিক আর্থিক সম্পর্ককেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

তাই উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে বিসকান্ধার কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনের চিত্র ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। একদিন একরাত হেঁটে জিরানিয়ার অন্য অংশে বিসকান্ধায় এসে পৌঁছেছে ঢোঁড়াই। শুধু পথের দূরত্ব নয়, এখানে সমাজচিত্রের ভিন্নরূপ দেখা যায়। ঢোঁড়াই নিজেও অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে— জীবনের আবেগময় অংশ রামিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ। অনেক নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত এখন সে। দ্বিতীয় চরণে তার আত্মনিরপেহ্ল সত্তা পেয়েছে ভিন্ন হ্লেত্রে প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনগুলি ততদিনে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই সহজেই সেই তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে— আত্মমর্যাদা পেয়েছে নেতৃত্বের ভূমিকায়। বিসকান্ধার কোয়েরীটোলার মানুষগুলির কাছাকাছি এসেছে। কৃষিনির্ভর সমাজের সাধারণ মানুষগুলির মাটির সঙ্গে নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনের কৃত্য-করণ, আচার-আচরণ মৃত্তিকাকেন্দ্রিক। "তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প করত কালেভদ্রে। কিন্তু এখানকার হাওয়াটাই অন্যরকম। এখানকার হাসি-কান্না গল্প রঙ্গ তামাসা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।"[৩০] কিন্তু মাটি ফসল এসবের প্রতি অধিকার তারা অর্জন করে নি। ভুমিকে ভালোবাসলেও ভুমির ওপর তাদের কোনো জোর নেই। সে সব ভোগ করবে দুরের মানুষ বাবুসাহেব, বচ্চন সিং, আনোখিবাবুরা। আর বিলটা, বুড়হাদাদা যারা হ্লেতের ফসলের সবুজে বিসকান্ধাকে দেয় নিত্য প্রাণশক্তি- তারা খাজনার দায়ে পীড়িত হয়। ফসলের ভাগের জন্য ভিহ্লা করে। দারিদ্র্য আর শোষণ এদের নিত্যসঙ্গী। তার ওপর, সময়টা বড়ো খারাপ। সারা দেশ জুড়ে চলছে আকাল, অনাবৃষ্টি।

তার সঙ্গে পয়সার আকাল, শুধু বিসকান্ধায় নয়, সারা জিরানিয়ায়। ঢোঁড়াই এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এরা এদের অবস্থার কথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করছে— "ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য। আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। বিধিগতি বাম সদা সব কাহূ। ভগবান সব সময় সকলের উপর নারাজ, ...দেখা যাক ধানটা পাকলে যদি কিছু হালত বদলায়।"[৩১]

বিসকান্ধা বড়ো গ্রাম। অনেক দল, মানুষে মানুষে স্বার্থভেদ বিচিত্র এবং জটিল। তাৎমা সমাজের সঙ্গে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শহরের মানুষের সম্পর্ক ছিল কম। কিন্তু বিসকান্ধার সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজপুতরা জমির মালিক আর কোয়েরীটোলার মানুষগুলো তাদের আধিয়ার। রাজপুতদের জমির নিত্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। কোয়েরীরা তাদের জমিতে চাষ করে; মেয়েরা ঘরের ঝি এর কাজ করে। রাজপুত বাবুসাহেবই জমিদার, কিন্তু গান্ধী ভাবাদর্শ গ্রহণ করে নিজেকে 'কিষাণ' বলে পরিচয় দেয়। আধিয়াররা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে 'কিষাণ' বলায় সুবিধে আছে— সবরকমের সহানুভূতি, সরকারি সহায়তা পাওয়া যায় আবার খাজনার দায়ে দরিদ্র প্রজার জমি সহজেই গ্রাস করাও যায়। এখানকার লড়াই জমির জন্য, ফসলের জন্য। ঢোঁড়াই বুঝেছে বাবুসাহেবরা স্বেচ্ছায় বীজধান, ফসলের ভাগ দেবে না। জোর করে তা আদায় করতে হবে। বিসকান্ধায় সাধারণ মানুষ এই সূত্র ধরেই জেগে উঠেছে। এই সূত্র ধরেই গান্ধীজীর শিষ্য 'বলন্টিয়ার' তাদের কাছাকাছি এসেছে। মাটির আকর্ষণে তারা একজোট হয়েছে। অন্যদিকে বাবুসাহেবও বিরোধী শক্তি গড়ে তুলেছে গিধর মণ্ডলের মতো জমিলোভীকে নিয়ে আর দারোগা পুলিশের সঙ্গে সন্তোষের সম্পর্ক বজায় রেখে।

ঢোঁড়াই-বিলটারা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে লড়াইএর প্রাথমিক প্রেরণা পেয়েছিল স্বরাজ আর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান থেকেই। "মহাৎমাজীর' পাশে সর্বস্ব নিয়ে দাঁড়ানোর উৎসাহ যত না 'রংরেজ'কে হটানোর জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনাসঞ্জাত, তার চাইতে বেশি বর্গীয়

শোসন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার স্বপ্ন-সম্ভুত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল; গান্ধী আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিরা' সত্যি সত্যিই এদের শোষণমুক্তির লক্ষ্যে সক্রিয় হন না। বরং তাদের গোপন বোঝাপড়া বচ্চন সিংদের সঙ্গেই। ১৯৩৪ এর ভূমিকম্প বিসকান্ধার জীবনে আকালের মতোই দুঃসময় আর দুঃস্বপ্ন নিয়ে এলো। বাবুসাহেবরা, রাজপুতরা এই বিপদের সুযোগে সাধারণ মানুষগুলোর কাছে আরো বৃহৎ সুবিধা আদায়ের জন্য অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। সরল গ্রামীণ মানুষগুলো এদের বিশ্বাস করে। লাডলীবাবুরা ভূমিকম্পে রিলিফের কাজে নেমে পড়ে। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে চায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। ঢোঁড়াইরা লাডলীবাবুদের উৎসাহবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমি থেকে বালি সরায়। লাডলীবাবুরা তাদের বোঝান— "এই তো চাই। নইলে সরকারের ভরসায় বসে থাকলেই হয়েছে। পাক্কীর ফাটল মেরামত হবে; তবে আসবেন হাকিম সাহেবরা হাওয়া গাড়িতে। পথ দেখাতে পারলে কি আর সাথে চলার লোকের অভাব হয়? এবার বিসকান্ধার সব কুয়ো ঢোঁড়াই তোমার দলকে করতে হবে। এইতো কাংগ্রিস আর মহাৎমাজীর হুকুম।"[৩২] এমনিভাবে লাডলিবাবু তাদের সরল দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছিল দেবতা। বিসকান্ধার মানুষগুলোর স্থির কর্মময় জীবনে এমনিভাবে মহাত্মাজী 'কলির রঘুনাথ' বিস্তার করেছিলেন মহত্ত্বের আসন। রিলিফের কাজে তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের বোঝানো হয়েছিল তারা হুতিপূরণ পাবে। কংগ্রেসের লোকেরা এসে হুয়হুতির পরিমাণ দেখে যাবে। লাডলীবাবু ও তার সাথীদের রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে আসবে তাদের জন্য সরকারি সাহায্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল লাডলীবাবুর যে সহকর্মী বচ্চন সিং এর বাড়িতে থেকে রিপোর্ট তৈরি করেছেন, তাঁর মতে হুয়হুতি হয়েছে শুধু রাজপুতদের আর গিরিধারী মণ্ডলের। কার্যত হতদরিদ্র কোয়েরীদের চোখের সামনে রিলিফ পেল তারা, যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে।

ঢোঁড়াই আর কোয়েরীরা দেখল, চোখের সামনে লাডলীবাবুরা ভূমিকম্পের রিলিফের টাকায় নিজেদের ছাতলাধরা বাড়ি ঘরদোর নতুন করে বানিয়েছে। কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র আর লাডলীবাবুর স্বরূপ বুঝে উঠতে আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে অস্থির কোয়েরীটোলার আরো কিছু সময় লেগেছে। অথচ কংগ্রেস এবং গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে একটা বিপুল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সুযোগ ছিল। কৃষি-ভিত্তিক গ্রামের সমাজে যে নিরন্তর শোষণ প্রক্রিয়া বহমান যার একদিকে প্রভূত জমির মালিক মুষ্টিমেয় বর্ণাভিমানী মানুষ আর অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন চাষি, হ্লে তমজুর অথবা সামান্য কৃষিজমি সম্বল প্রান্তিক মানুষ, তার একটা পটবদলের সম্ভাবনা কংগ্রেসের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতপুষ্ট সামন্তপ্রভুদের শ্রেনিস্বার্থের সহায়ক শক্তি হিসাবে কংগ্রেস এর অবস্থান ও ভূমিকা এই পরিবর্তনের প্রতিকূলে দাঁড়ায়। ফলে দেশের নিপীড়িত জনমানসে মহাত্মার আবির্ভাবের আলোকবিন্দু ক্রমশ মরীচিকা হতে থাকে। আসলে গান্ধী নিজেও জানতেন, সম্পন্ন কৃষক সমাজের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া কংগ্রেস নামক দলটিকে দেশের জনসাধারণের মূল প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপন যেমন অসম্ভব, একটা গণসংগঠন গড়ে তোলাও তেমনি দিবাস্বপ্ন। কংগ্রেসের এই শ্রেণিচরিত্র সতীনাথ এর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। উপন্যসে দেখি কয়েকহাজার বিঘা জমির মালিক বচ্চন সিং নিজেকে 'কিষাণ' পরিচয় দিয়ে সাওঁতাল টোলা ও কোয়েরীটোলাকে পদদলিত করেন কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে লাডলীবাবু কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে সাদরে গৃহীত হয়ে অনবিলম্বে রাজপুত ভূমিহারদের গরিষ্ঠ অংশের সমর্থনে বড়দরের নেতা বনে যান। আর সর্বস্বত্যাগী মাস্টারসাব দলে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেন। এর অঙ্ক না বুঝে ঢোঁড়াইদের মতো সাধারণ লড়াকু মানুষরা কংগ্রেসী 'বলন্টিয়র' এর প্রতিটা কথাকে বেদবাক্য মেনে কংগ্রেসে দরখাস্ত-করে জমির দলিল ফেরত পাবার স্বপ্নে বিভোর থাকে আর কোয়েরীটোলার সাধারণ মানুষ ভাবে কংগ্রেসী জমানায় সব

শোষণের অবসান হবে।

ইতিহাস বলছে এই 'কংগ্রেসী জমানা'র সূত্রপাত কংগ্রেসের সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত থেকে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের হ্ল মতার দ্বন্দ্ব থাকলেও নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। সতীনাথ বিহারের পটভূমিতে এই সরকার গঠন প্রক্রিয়ার নেপথ্য ছবিটা তুলে ধরেন বিসকান্ধায় কোয়েরীদের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে সর্বস্ব হারাবার পর রিলিফের পরিহাসের অপমান তাদের মুছে যায় যখন মহাত্মাজীর শিষ্য 'বলন্টিয়ার' এসে জানায় সারা মুলুক জুড়ে 'বোট' হচ্ছে আর রামরাজ্য চাইলে মহাত্মাজীর চিঠির উত্তরে সাদা বাক্সে পাল্টা চিঠি ফেলতে হবে। যে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন 'Truth is the first to be sought for'।[৩৩] তাঁকেই রাজনীতির আবর্তে অর্ধসত্যের আবরণে বন্দি হতে হয়। ১৯৩৫ সালে ঢোঁড়াই প্রথম ভোট দেয় বিসকান্ধার অধিবাসী ঢোঁড়াই কোয়েরী– পিতা কিরতু কোয়েরী হয়। "রাজনীতি ঢোঁড়াইদের জন্য তাৎহ্ল ণিক পরিচয় তৈরি করে নেয়। আজকের গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নিত্য ভোটোৎসবের সাহ্লী পাঠকের নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি থাকে না বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ। এই আপাত অন্যায়ের সহযোগী হয় এরা সবাই কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 'গান্ধী ইমেজ' এবং আরো বেশি করে রামরাজ্যের স্বপ্ন"।[৩৩]

অবশ্য এই মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন সময় লাগে নি। অবশ্য একথা বলা যায় গান্ধীর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছিল তাঁরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগতজনেরা, তারা 'মহাত্মাজী' নামের যে মোহ ছড়িয়েছিল,সে মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগল না। রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' প্রবন্ধে এই উক্তি করেছেন যে, "আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিক্যাল জুয়ো খেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান।"[৩৪] আবার এই পর্যবেহ্ল ণ যথার্থ যে " আসল কথা গান্ধীজীর আন্দোলন ছিল

ভাববাদী আন্দোলন। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কোনো চেষ্টা এ আন্দোলনে দেখা যায় না। তিনি অস্পৃশ্যতামুক্তি, জাতিভেদ মোচনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনে এর প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা অর্থনৈতিক মুক্তি— দারিদ্র্য মোচন করে অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যস্ত তিরিশ-চল্লিশের দশকেও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কোনো বিপ্লব, গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এমন মানুষগুলোকে অন্নমুক্তির স্বাদ দেওয়া হয় নি। এ ব্যাপারে কোনো সক্রিয় সংগঠন প্রচেষ্টা পরিকল্পনা ছিল না কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির। বরং এদের অশিক্ষা, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গান্ধীবাদী ভলন্টিয়ার থেকে শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক বচ্চন সিং সকলেই জুলুম আর শোষণ করে এসেছে।”[৩৫]

লাডলীবাবু ‘চেরমেন’ হবার পর পাকা রাস্তা থেকে বচ্চন সিং এর বাড়ি পর্যন্ত আরেকটি পাকা রাস্তা হয়। কিন্তু আধিয়ারদের জন্য যে নতুন কানুনের কথা শোনা গিয়েছিল, সেই কানুন হয় না। তথাকথিত ভুমিসংস্কার আইনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য শস্তায় সরকারি ‘ফারম’ বিক্রি করেন ‘বলন্টিয়ার’; অবশ্য বিনা রসিদেই। তারপর জানা গেল, ‘কলস্টর’ সাহেব মহাত্মাজীর আইন বদলে দিয়েছেন। তাতে লেখা আছে বাবুসাহেব বচ্চন সিং জমিদার নন, তিনি রায়তিস্বত্বধারী ‘কিষাণ’ মাত্র। তার ক্ষেত্রে ফসলের ১৮-২২ ভাগাভাগি খাটবে না।

ঢোঁড়াইর মতো সোজা সরল সাধারণ মানুষকে বলন্টিয়াররা শুধু ‘ঢোঁড়াইজী’ সম্বোধন করেই ঠকিয়ে যেতে পারে। এরপরে চলে আসে ‘রংরেজ জার্মান লড়াই’র ‘গরম তাজা খবর’। কংগ্রেসের উজির’রা ইস্তাফা দিয়েছেন। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডএর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন না লাডলীবাবু, কেননা যতদিন সুযোগ ততদিন ‘পাবলিসে’র উপকার

করতে চান তিনি। এরই মাঝে শুরু হয় সত্যাগ্রহ। সাধারণ মানুষের চোখে এটাও এক তামাসা, 'সতিয়াগিরার তামাসা'। দারোগা না এলে আবার শুরু হয় না এ তামাসা'। কোয়েরী সাওঁতালদের চোখের সামনে লাডলী – ইনসানদের সম্মিলিত চোরাকারবার ফুলে ওঠে। নদীর ধারের জমি গুটি পোকা চাষের নামে গ্রাস করেন বাবুসাহেব। গান্ধীজী কারাবন্দি হন।

প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সে বিদ্রোহ হয় হিংসাত্মক। চৌরিচৌরার ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয় তিতলি কুঠির দাহনকাণ্ড। বাবুসাহেব এই সাধারণ মানুষগুলোর হাতে লাঞ্ছিত হন। গান্ধীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় উত্তাল হয় জনতা। থানা দখল হয়ে যায়। এসে যায় স্বরাজ।

আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঢোঁড়াই বুঝতে পরে কংগ্রেসি রাজনীতির মিথ্যাচার ও শূন্যগর্ভতা। আর আজাদদস্তা কিংবা ক্রান্তিদলেও রয়েছে অন্তহীন ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ও দলাদলি। সভা মানেই ঝগড়াঝাঁটি। সতীনাথ ব্যাপক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পরাধীন ভারতের মূল স্রোতের রাজনীতি সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন। নিরহ্লর ঢোঁড়াই ও তার আত্মসন্ধানের দীর্ঘপথের শেষে যখন সক্রিয় রাজনীতির উত্তপ্ত আবর্তে পড়েছে— তখন গোটা জীবনের শিহ্লায় সেও হতাশ হয়েছে। যাদের শ্রদ্ধা করত তাদের কাউকে আর শ্রদ্ধা করেত পারছে না। যে রামায়ণ কোনোদিন বদলায় না বলে বদ্ধমূল ধারণা ছিল তার, আজ সে বিশ্বাসও রাখতে পারছে না। সতীনাথ ঢোঁড়াইএর রাজনৈতিক জীবনের হতাশার সঙ্গে মিশিয়েছেন ঢোঁড়াইএর ব্যক্তিজীবনের হতাশাকেও— দ্বিতীয় চরণের রাজনৈতিক-সামাজিক টেনশনমুখর গল্প সমাপ্ত করেছেন, ঢোঁড়াই এর ব্যক্তিগত স্বপ্ন-ভঙ্গের মধ্যে এনে। এ্যন্টনিকে দেখে রামিয়ার পুত্র ভেবে আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াতে চেয়েছিল সে। সব ভুল ভ্রান্তিকে আর একবার তলিয়ে দেখে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে অসুস্থ এ্যন্টনিকে নিয়ে তাৎমাটুলিতে ফিরেছিল

ঢোঁড়াই। কিন্তু ঢোঁড়াইদের কোনো স্বপ্নই সত্যি হয় না। শ্রেণির অধিকারের স্বপ্ন, সংগ্রামে জয়ের স্বপ্ন, এমনকি ব্যক্তিজীবনে বাঁচার স্বপ্ন— কোনোটাই সফল হয় না। এ্যন্টনি রামিয়া বা তার সন্তান নয়। সুতরাং ঢোঁড়াইকে ফিরতে হয়। সময়ের ব্যবধান, জীবনের পারস্পরিক ভুলভ্রান্তিতে সৃষ্ট ব্যবধান, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবের চূড়ান্ত পরিণতিতে ব্যবধান ক্রমেই বিশাল হয়— তখন অসহায় ও বিপন্ন ঢোঁড়াইকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ঢোঁড়াইকে কেন্দ্রে রেখে প্রান্তবাসী এই সাধারণ মানুষগুলোর চোখ দিয়ে ভারতবর্ষের বিশবছরের ঘটনাপ্রবাহের পর্যবেহ্লণের শেষে হতাশাই প্রবল হয়ে ওঠে। তাই খোলা আকাশের থেকে কারান্তরালই শ্রেয় হয়ে উঠেছিল ঢোঁড়াইর কাছে। সুতরাং আহ্লরিক অর্থেই বাংলা সাহিত্যে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এক দোসরহীন সৃষ্টি।

৩

তিরিশের দশকের শেষ এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির অংশগ্রহণ এবং শ্রেণি স্বার্থনিয়ন্ত্রিত ভূমিকা— এগুলির ইতিহাসম্মত প্রকাশ ঘটেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসদুটিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে দেশের সাধারণ মানুষও ব্যাপক সংখ্যায় সামিল হয়েছিলেন। অথচ ব্যাপক জনগণের স্বরাজসাধনাকে নির্দিষ্ট অভিমুখ দান করা কংগ্রেসের পহ্লে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কংগ্রেসের মধ্যেই গড়ে উঠে প্রান্তিক মানুষের অধিকার সম্পর্কে সহানুভূতিশীলদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, যারা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট বলে পরিচিতি লাভ করেন। এ ছাড়াও তিরিশের দশকেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সভা ইত্যাদি গণসংগঠন গড়ে উঠে। তিরিশ দশকেই ডাক-তার, রেলওয়ে, সুতাকল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটা সংগঠিত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের

ফলশ্রুতিতে প্রাদেশিক নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস / লিগ হ্লমতার স্বাদ পেয়েছিল। জনগণের স্বপ্ন ও চাহিদা স্বরাজ এর লহ্ল্যের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ সেই পর্ব থেকেই প্রত্যহ্ল হয়ে উঠেছিল। স্বরাজের আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল নেতৃত্বের ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত। গণচেতনার স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকাশের পথ গোড়াতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। স্বরাজের উদ্যোগ ও আকাঙ্হ্লাকে সব দিক থেকে গুটিয়ে এনে চরকা কাটার যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত করবার পেছনে ধূর্ত শ্রেণিস্বার্থের ভূমিকা ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটা অনুধাবন করেছিলেন। দেশকে ত্যাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা, কর্মের দ্বারা গড়ে তোলার প্রয়াস ও পদ্ধতি দূরে সরে নিছক চরকা কাটায় কর্তাভজার দল সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু স্বরাজ আসতে পারে না— রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে'র প্রবন্ধমালায় বারবার এই সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর কাছে স্বরাজ হল সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা। কবির ভাষায় "সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের আন্নের অভাব, শিহ্লার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।"[৩৬] দেশের মানুষের চিত্তদৈন্য দূরীভূত করে আত্মকর্তৃত্বের শক্তিতে তাকে হ্লমতাবান করে তোলবার আয়োজন ছিল না কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডে। ফলত গান্ধী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অভিমূখ কার্যত ছিল দিশাহীন। নেতৃত্ব চেয়েছিলেন শ্রমজীবি এবং কৃষকদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকে কলোনি শাসনের সঙ্গে দরকষাকষির হ্লেত্রে ব্যবহার করতে। কিন্তু যখনই দেখা গেছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন সাম্রাজ্যবাদ ও তার

তাবেদার দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুকভরা ঘৃণা নিয়ে, তখনই নানা ছলাকলায় উর্বর আন্দোলন থেকে সরে এসে কলোনি শাসনের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকেই আপাতত 'শান্তিকল্যাণ' স্থাপন করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের প্রধান ধারার এই 'ধরি মাছ না ছুই পানি' নীতির সমালোচনায় কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। তারা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট অভিমুখ দিতে না চাইলেও জোতদার জমিদার বিরোধী ক্রোধকে অনুধাবন করে কৃষক সাধারণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের সময় যুদ্ধে ব্যস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর ভেতর থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে স্থানে স্থানে গণ অভ্যুত্থান গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এই কর্মসূচির সমর্থন করেন নি, উলটে গান্ধী তখন ব্রিটিশকে বিব্রত না করতে ব্যক্তিগত আইন অমান্যর ডাক দেন। ব্যাক্তিগত 'আইন অমান্য' অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কারাবরণ। এভাবে জনগণ যখন সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত, তখন নেতৃবৃন্দ জেলে চলে গেলেন। সোস্যালিস্টরা সংখ্যায় ছিলেন কম, আন্দোলনকে সুস্পষ্ট রণনীতির উপর দাঁড় করতে পারলেন না, স্থানে স্থানে অভ্যুত্থান ঘটল নানারকমভাবে। পুলিশ হত্যা, সরকারি সম্পত্তি, রেললাইন ইত্যাদি ধ্বংস করা চলল।

এই সময়ে কমিউনিস্টরাও একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থান নিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধে যখন সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও জড়িয়ে পড়ল, তখন কমিউনিস্টরা বড়ো সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে জনযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে আগস্ট আন্দোলন থেকে দূরে রইলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। সতীনাথের আলোচিত দুটি উপন্যাসেই আগস্ট আন্দোলনের এই পর্বের ইতিহাস ঔপন্যাসিকতায় বিন্যস্ত হয়েছে।

'জাগরী'র বাবা আগস্ট আন্দোলনের সময় 'একক আইন অমান্য' করে ভারত রক্ষা

আইনে গ্রেফ্তার বরণ করেছিলেন। আর বিলুর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট শিবির স্থানে স্থানে সংগ্রামী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে দিশাহীন গণ অভ্যুত্থান গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে জনযুদ্ধ নীতির সমর্থক কমিউনিস্ট নীলু তার দলের রাজনৈতিক লাইন অনুসারে (যোশী লাইন) ঔপনিবেশিক সরকারবিরোধী ধ্বংসযজ্ঞে রেললাইন উপড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত বিলুকে সনাক্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে সাহ্ল্য দেয়। সতীনাথ নিজেও ৪২ এর আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছিলেন, এবং তিনি নিজেও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট বা আজাদ দস্তায় যোগ দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। এই দলের মধ্যেকার দলাদলি ও অন্তঃসারশূন্যতা তাকে বিচলিত ও বিরক্ত করেছিল। দেশ যখন জেগে ওঠে, তখন জেগে ওঠে তার পরিবারও— অন্তত মধ্যবিত্ত অংশ। মতাদর্শের সংঘাতও অনিবার্য হয়ে পড়ে। গণজাগৃতির পটে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় রাজনৈতিক সময়কে সতীনাথ ধরে রেখেছেন 'জাগরী'তে এক নিরাসক্ত নিরপেহ্লতায়। এই নিরপেহ্লতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ– "সবচেয়ে যা আশ্চর্য লাগল তা লেখকের নিরপেহ্লতা। লেখক তিনটি রাজনৈতিক মতাদর্শ তিনটি বা চারটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসখানিতে উপস্থাপন করেছেন; এবং লেখক নিজেও ওই তিন আদর্শের একটি জীবনে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোনটি যে তাঁর নিজের সে সম্পর্কে উপন্যাসখানি পাঠ করার শেষ পর্যন্তই সংশয় থেকে যায়। প্রতিটি মতের পূর্ণ মূর্তিটিকে তিনি আপ্রাণ আন্তরিকতার সঙ্গে আঁকবার চেষ্টা করেছেন।"[৩৭]

'বাবা'র চরিত্রের পেছনে একাধিক ব্যাক্তির ছায়াপাত ঘটেছে বলে আলোচকেরা দেখিয়েছেন। পুরুলিয়ার প্রখ্যাত হেডমাষ্টারমশাই নিবারণ দাশগুপ্ত, যিনি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ঘটনা জনজীবনে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। ছায়া পড়েছে পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য গোকুলকৃষহ্ণ রায়ের ও।[৩৮] চরকা কাটা ও গান্ধী শরণকে ভারতের আবেগপ্রাবণ মানুষ একসময় ধর্ম বলে মানতেন। এই চেতনা যে কতটা গভীর

ছিল, তা 'জাগরী'র বাবাকে দেখে বোঝা যায়। সন্তানের ফাঁসির সময় নিকটপ্রায়, মানসিক অস্থিরতা কাটানোর জন্য চরকা নিয়ে বসে পড়েছেন জেলবন্দি বাবা। অন্ধের যষ্টির মতো, জপের মালার মতো অশান্ত, উদ্বিগ্ন মুহূর্তে চরকাকে ধারণ করতেন সর্বত্যাগী কংগ্রেসীরা। এই কংগ্রেসীদের আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর রূপ দেখেছি লাডলীবাবুর মধ্যে— যাদের কাছে গান্ধী মহারাজের নামটি আত্মস্বার্থ চরিতার্থকরণের একটা উপাদান মাত্র। গ্রামের সাধারণ মানুষ কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর প্রতি ভাব— ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে কংগ্রেস ভলন্টিয়ারদের কথামতো সত্যাগ্রহ আইন অমান্যে সামিল হয়েছে কোনো কিছু না বুঝেই। বাবা যেমন ছেলের ফাঁসির আগে মহাত্মার কাছে প্রার্থনা করেন বিলুর মাকে তিনি যেন আঘাত সহ্য করবার শক্তি দেন, তেমনি সাধারণ গ্রামীণ মানুষও মহাত্মাজী আর মাস্টারসাহেব ছাড়া আর কাউকে জানে না। এতটুকু জানাই হল প্রান্তিক মানুষের দেশচেতনার সীমা। নীলুর চোখে এই বাস্তবকে দেখিয়েছেন লেখক। আমাদের দেশ সাধনায় তিরিশ চল্লিশের দশকে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে যে অহৈতুকী ভক্তিভাবনার প্লাবন বইছিল- সেটা আজকের দিনে হয়ত বুঝে ওঠাও কষ্টকর। সতীনাথ এই বাস্তবকে জীবন্ত করে রেখেছেন।

অন্যদিকে, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে প্রান্তকায়িত পরিসরে গান্ধী ভক্তির বাস্তবকে খোদাই করে রেখেছেন সতীনাথ। কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে রেডিক্যাল গ্রুপ তৈরি হয়েছিল 'আজাদ দস্তা' বা 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে, উপন্যাসদুটি মিলিয়ে পড়লে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। জাগরী উপন্যাসে নীলু অংশে গান্ধীবাদী কংগ্রেসের দুর্বল দিকটির দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। বিলু উপলব্ধি করেছে যে "এক মাস্টারসাহেব আছেন বলিয়া এ জেলায় মহাত্মজীর কাজ কিছু হয়। না হইলে ইহাদের আর্ধেক লোক তো ঠগ'। সত্যইতো কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে। জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিতহ্লে ত্রে

আধিয়াদার, বাটাইদারি বা নিঃসম্বল হ্লেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সহদেও এর মতো কংগ্রেস কর্মীও আধিয়াদারদের কায়েমী স্বত্ব বন্ধ করিবার জন্য বন্দোবস্তীর মিথ্যা দলিল তৈয়ারি করিয়াছে।"[৩৯] আজাদ দস্তার যে সব কর্মকাণ্ড দুটো উপন্যাসেই রয়েছে, তা সতীনাথের প্রত্যহ্ল অভিজ্ঞতারই ফসল। বিলু ও ঢোঁড়াই দুটি চরিত্রের অভিজ্ঞতাতেই ৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের বাস্তব ছবি প্রগাঢ় ছায়া ফেলেছে।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক চিন্তাচর্চার তীর্থস্বরূপ হয়ে উঠেছিল ভারতের জেলখানাগুলি। স্বদেশি যুগে অনুশীলন সমিতি, গদর পার্টি, যুগান্তর দল ইত্যাদি ক্রান্তিকারী বা বিপ্-বপন্থী যারা ধরা পড়ে জেলে গেছিলেন, তারা জেলে বসেই রুশ বিপ্-বের ইতিহাস, এস.এন. রায়ের থিসিস ইত্যাদি পড়াশুনা করতেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার এই কমিউনিস্টরা বিপ্-বী হয়ে জেলে ঢুকতেন, বেরোতেন কমিউনিস্ট হয়ে। জেলে মতাদর্শের পাঠ সম্পূর্ণ হত। আবার সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মত ও পথের দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল, দ্বন্দ্ব ছিল নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরেও। মতাদর্শগত স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা ততটা ছিল না, যতটা ছিল প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলবার আবেগ। কৃষক সভা ও ছাত্র ফেডারেশন এর মধ্য দিয়ে জমিদার ও ধনিক বিরোধী শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেন কমিউনিস্টরা। ৪২ এর ভুল সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম এবং সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অভিপ্রায়ে কোনো মেকিত্ব বা ফাঁকি ছিল না। যখন কৃষক সভার শ্রেণি আন্দোলনের প্রশ্নে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বের 'সমজতন্ত্র' ফিকে হয়ে পড়ে এবং কংগ্রেসের দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হয়, তখন বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।[৪০]

সতীনাথ ভাদুড়ি নীলুর মধ্যে দিয়ে এই কমিউনিস্টদের ছবি এঁকেছেন। জেলের ভেতরে মতাদর্শের চর্চা এবং কমিউনিষ্ট এর জীবনশৈলীর ছবিও দুটি উপন্যাসে রয়েছে, একটু স্থুলভাবেই। স্থুল এজন্যেই যে, কমিউনিস্টদের চিন্তা ও যাপনশৈলী সতীনাথ দেখেছেন বাইরে থেকেই। হয়ত একটু অসহিষ্ণুতাও কাজ করেছিল তাঁর শিল্পী অস্তিত্বে। তাই ছারপোকার রক্ত দিয়ে নীলুর 'অহিংসা পরম ধর্ম' লেখা, সরস্বতী মূর্তির উপর জুতো তুলে রাখার মতো বালখিল্য উপাদানে নীলুকে আঁকা হয়েছে। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঢোঁড়াই একদিকে যেমন 'রামরাজ্য' কল্পনার অসারতাকে বুঝেছে লাডলীবাবু- ইনসান আলি-বচ্চন সিং দের কর্মতৎপরতার দর্পণে, অন্যদিকে আজাদ দস্তা বা ক্রান্তিদলের নেতৃত্বের মধ্যে ফাঁপা বুলির চর্চাও তার কাছে উপাদেয় ঠেকল না, সে সামিল হতে পারল না। নিম্নবর্গীয় শ্রেণিগুলির অংশগ্রহণের চরিত্র এবং তাদের প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশচেতনায় দীপ্তিত করে দেশসেবার উপযুক্ত করে তুলতে না পারার যে ব্যর্থতা সতীনাথ চিহ্নিত করেছেন, সেটা আগস্ট আন্দোলনেরই ব্যর্থতার দিক। মতাদর্শের শিল্পা সে তুলনায় অনেকটাই গভীর প্রোথিত করছিলেন কমিউনিস্টরা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পায়। লখনৌ কৃষক কংগ্রেসের (১৯৩৮) অধিবেশনের দলিল এদিকেই ইশারা করে। কিন্তু সতীনাথ যে রাজনৈতিক পরিসরকে ধরেছেন দুটি উপন্যাসে, তার সাফল্য-ব্যর্থতা ইতি ও নেতি সবটাই '৪২ এর আগস্ট আন্দোলনকে ঘিরে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অত্যন্ত উর্বর একটি পর্বের ইতিহাসের সৎ নভেলাইজেশানের দৃষ্টান্ত হিসাবে সতীনাথের উপন্যাস দুটি বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

উল্লেখপঞ্জিঃ

(১) 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পা সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৮।

(২) ভট্টচার্য অরূপ কুমার ঃ সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২-৫।

(৩) 'সতীনাথ ভাদুড়ী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

(৪) ঐ, পৃ. ৪০।

(৫) ঐ, পৃ. ৯১।

(৬) ঐ, পৃ. ৩০।

(৭) ভাদুড়ী সতীনাথ ঃ জাগরী, কলকাতা ঃ পৃ. ৫৫।

(৮) ঐ, পৃ. ৫৬।

(৯) ঐ, পৃ. ৬০।

(১০) ঐ, পৃ. ৬৪।

(১১) ঐ, পৃ. ৭১।

(১২) ঐ, পৃ. ১৪২।

(১৩) ঐ, পৃ. ১৪১।

(১৪) ঐ, পৃ. ১৪৪।

(১৫) ঐ, পৃ. ১৪৪।

(১৬) ঐ, পৃ. ১০।

(১৭) ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫।

(১৮) ঐ, পৃ. ১৪৫-১৫৫।

(১৯) ঐ, পৃ. ১৫৫।

(২০) ঐ, পৃ. ১৫৫।

(২১) ঐ, পৃ. ৩৭।

(২২) ঐ, পৃ. ১৪৩।

(২৩) ঐ, পৃ. ১১১।

(২৪) ঐ, পৃ. ৬২।

(২৫) 'সতীনাথ স্মরণে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

(২৬) সমরেশ মজুমদারঃ সতীনাথ ভাদুড়ী ও সমকালীন বাংলা উপন্যাস; স্বাগতা দাস মোহান্ত সম্পাদিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস অন্ত্যজ জীবনের মহাকাব্য', কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৭।

(২৭) ভাদুড়ী সতীনাথঃ ঢোঁড়াই চরিত মানস, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৪।

(২৮) ঐ, পৃ. ২৭।

(২৯) হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'ঢোঁড়াই চরিত মানসঃ অনন্যতার সন্ধানে', ঢোঁড়াই চরিত মানস অন্ত্যজ জীবনের মহাকাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

(৩০) ঢোঁড়াই চরিত মানস, পৃ. ১৩৩।

(৩১) ঐ, পৃ. ১৩১।

(৩২) ঐ, পৃ. ১৬৯।

(৩৩) রায় শ্রাবণী ঃ 'গান্ধীজী এবং মহাত্মা ঃ উপন্যাসে বিরোধাভাস; ঢোঁড়াই চরিত মানস অন্ত্যজ জীবনের মহাকাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

(৩৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড 'সত্যের আহ্বান', প্রাগুক্ত, ২০১১, পৃ. ৯৪৮।

(৩৫) মণ্ডল স্বস্তি ঃ সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭৪-৭৫।

(৩৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্বরাজ সাধন', 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৪০৯, পৃ. ২৭৮।

(৩৭) উদ্ধৃত ঃ শঙ্কর ঘোষ ঃ 'জাগরী চরিত্রে ও চেতনায়, হার্দ্য, বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫-১৬।

(৩৮) ঘোষ শঙ্কর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

(৩৯) ভাদুড়ী সতীনাথ ঃ 'জাগরী' প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২।

(৪০) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ঃ তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস ঃ কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৭-১৯।